

নাম: ইকরাম হোসেন কাউসার

জন্ম তারিখ: ১ জানুয়ারি, ২০০০

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ছাত্র,

শাহাদাতের স্থান : লক্ষ্মীবাজার, পুরান ঢাকা, কোতয়ালী, ঢাকা

শহীদেদের জীবনী

“স্বপ্ন ছিল বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার
পুলিশের গুলিতে অন্ধুরেই বিনষ্ট”
মুহুর্তেই ইকরামের মগজ ছিটকে পড়ে সড়কে”

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসার ছিলেন ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলার রাজশপুর ইউনিয়নের পাগলিরকুল গ্রামের একজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ। ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া কাউসার ছিলেন মাওলানা আনোয়ার হোসেন ও রুমা আক্তারের মেজো ছেলে। বাবা একজন স্কুল শিক্ষক, যিনি অল্প আয়ে তাঁর তিন সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। কাউসারের ছোট ভাই ইমরান হোসেন একজন শিক্ষার্থী এবং বোন জান্নাতুল ফেরদাউস বড় বোন হিসেবে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কাউসার পড়াশোনার পাশাপাশি কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন এবং তিনি কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ছিলেন। এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে, তিনি অনার্স শেষ করেন এবং মাস্টার্স পড়ছিলেন, তার স্বপ্ন ছিল বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিবারের দুঃখ-কষ্ট দূর করা। বাবা তার পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য জমি বিক্রি করেছিলেন, সেই স্বপ্নের অন্ধুরেই বিনাশ ঘটে পুলিশের গুলিতে। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে পুলিশ হামলায় আহত হয়ে বিকাল ৪:১৫ মিনিটে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। পরিবারের সদস্যরা সেই রাতেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে পরদিন সকালে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসেন। কাউসারকে তাঁর নিজ গ্রাম পরশুরামে দাফন করা হয়। একরাম ছিলেন বিনয়ী ও পরিশ্রমী। পড়াশোনার প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ এবং পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্বশীলতা তাঁকে সকলের প্রিয় করেছিল। তাঁর মায়ের মতে, কাউসার কখনও অযথা সময় নষ্ট করতেন না, পড়াশোনা এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেই তিনি নিবেদিত ছিলেন। কাউসারের স্বপ্নগুলো পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি দেশের জন্য আত্মত্যাগ করলেন, তাঁর এই অমূল্য জীবনহারানোর বেদনা আজও তাঁর পরিবার ও পরিচিতদের হৃদয়ে জাগরুক।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

থমথমে পরিস্থিতি সারা দেশে। সর্বাঙ্গিক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে গত তিন দিনে সারা দেশে শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ।

আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দিয়েছেন যে, ৯ দফা দাবি না মানা পর্যন্ত চলবে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’।

সকালে মহানগর মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ এবং কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ঢাকায় চাকরির পরীক্ষা দিতে এসেও অনেকেই আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথমে তারা বাহাদুরশাহ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। এরপর শিক্ষার্থীরা বাংলাবাজারের প্রবেশমুখের গলিতে আশ্রয় নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন—“কোটা না মেধা, মেধা মেধা”, “আবু সাঈদের মৃত্যু কেন, প্রশাসন জবাব চাই”, “নয় দফার বাস্তবায়ন, করতে হবে করতে হবে” ইত্যাদি।

শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চললেও পুলিশের আচরণ হঠাৎই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস ছুড়তে শুরু করে। জুমার নামাজের আগেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা জড়ো হন লক্ষ্মীবাজার সড়কে। একপাশে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা, অন্যপাশে বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে পুলিশের অবস্থান।

সেদিন শিক্ষার্থীরা রাজপথেই জুমার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে দলে দলে সাধারণ জনতা ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। স্লোগানে মুখরিত হতে থাকে গোটা এলাকা। পুলিশের হাডমাইকে আন্দোলনকারীদের রাজপথ ছেড়ে যেতে বলা হয়; অন্যথায় গুলি চালানোর হুমকি দেওয়া হয়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষার্থীর একটি প্রতিনিধি দল পুলিশের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানায়, যেন তারা কোনো হামলা না করে এবং শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাঁধা না দেয়। কিন্তু পুলিশ তাদের অনুরোধ গ্রহণ করেনি। পুলিশের জবাব ছিল, “আপনাদের ভিসির নির্দেশনায় আমরা এখানে এসেছি।” এরপর আন্দোলনকারীরা ‘ভুয়া, ভুয়া’ ধ্বনি দিতে থাকেন এবং ‘আমার ভাই মরলো কেন-বিচার চাই, বিচার চাই’, ‘কোটা না মেধা-মেধা মেধা’সহ নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করে। নিজেদের রক্ষা করতে আন্দোলনকারীরা রাস্তায় আঙুন জ্বালায়। পুলিশ একের পর এক রাবার বুলেট ছুঁড়তে থাকে। পুলিশের বিপরীতে নিরস্ত্র শিক্ষার্থীরা ইটপাটকেল ছুঁড়তে শুরু করেন। এক পর্যায়ে পুলিশ সরাসরি গুলিবর্ষণ করে।

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসার ছিলেন কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী।

তিনি বঞ্চিত ছাত্রদের অধিকার আদায়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, পুলিশের গুলিতে তিনি নিহত হন। ঘটনাটি ঘটে পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের পাতলাখান এলাকায়।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময়, ১৭ ও ১৮ জুলাই রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় অনেক ছাত্রের মেসে খাওয়া-দাওয়া অনিয়মিত চলছিল। ইকরামও তাদের একজন। ১৯ জুলাই শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে ক্ষুধার্ত ইকরাম একটি ভাসমান দোকান থেকে ভাত খেয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। বিকালের দিকে পুলিশ আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ধাওয়া দিয়ে কবি নজরুল কলেজ থেকে সোহরাওয়ার্দী কলেজ পর্যন্ত নিয়ে যায়। আন্দোলনকারীরা আশ্রয় নেন আশপাশের গলিতে। পুলিশ এসব গলি চিনতো না, কিন্তু সঙ্গে থাকা যুবলীগের সন্ত্রাসীরা পুলিশকে গলির দিকনির্দেশনা দিতে থাকে।

এসময় পুলিশের সঙ্গে থাকা অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা পুলিশকে গুলি চালাতে তাড়িত করছিল। পুলিশ গুলিতে ঢুকে এলোপাড়াডি সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল ও গুলি ছোঁড়তে থাকে। পাতলাখান এলাকায় আন্দোলনকারীরা ঘাপটি মেরে ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা ক্লান্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিস্কুট, রুটি, পানি নিয়ে আসেন। ইকরামও অলিম্পিক বিস্কুটের একটি প্যাকেট খুলে একটি বিস্কুট খেতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পেছন থেকে একটি গুলি এসে তার মাথায় লাগে। মুহূর্তেই তার মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়ে মগজ ছিটকে পড়ে রাস্তায়। সেই গতিশীল বুলেটটি গিয়ে লাগে আরেকজনের চোখে। তিনিও ঘটনাস্থলেই মারা যান। ইকরামের ছিটকে পড়া মগজের সঙ্গে পড়ে থাকতে দেখা যায় অবশিষ্ট বিস্কুটটি ও তার প্যাকেট।

একজন দোকানদার এগিয়ে এসে মগজগুলো পলিথিনে করে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সরাসরি পুলিশের গুলিতে ইকরাম নিহত হন। তার মৃত্যুতে থেমে যায় তার পরিবারের হাল ধরার স্বপ্ন। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ইকরামের মরদেহ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার মৃত্যু শুধু তার পরিবার নয়, পুরো আন্দোলনের জন্য এক গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্যাম্পাসজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

সেদিন পুরো পুরান ঢাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্মীবাজারের বাতাসে টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝ, আর অলিগলিতে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ-নারী, শিশুরা চোখের জ্বালাপোড়ায় অস্থির। সাউন্ড গ্রেনেডের বিকট শব্দে বাসাবাড়ি থেকে ভীত শিশুদের চিৎকার আর নারীদের আতঙ্কিত হাহাকার শোনা যাচ্ছিল।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসারকে হত্যার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনাসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ১৮ আগস্ট ২০২৪, রোববার ঢাকা বারের সদস্য নাসরিন বেগম ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের মামলার আবেদন করলে শুনানি নিয়ে হাকিম তরিকুল ইসলাম অভিযোগটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করতে সূত্রাপুর থানাকে নির্দেশ দেন।

এ মামলায় অন্য আসামিরা হলেন- সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ফজলে নূর তাপস, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ নূরুল ইসলাম, সাবেক আইজিপি আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডিএমপির ডিবি সাবেক প্রধান হারুন অর রশীদ, অতিরিক্ত যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব সরকার ও ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান।

মামলার আবেদনে বলা হয়, কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ১৯ জুলাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজের সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা। আসামিদের মদদে পুলিশ ও তখনকার ক্ষমতাসীনরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

হামলাকারীরা এলোপাথারি গুলি করলে অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়, ধারাল অস্ত্রের আঘাতে অনেকেই জখম হয়।

হামলাকারীদের গুলিতে কবি নজরুল সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইকরাম হোসেন কাউসার মারা যান। প্রবল গণআন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া নবম মামলা এটি। (সূত্র: বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। ১৮ আগস্ট, ২০২৪)

বন্ধু ও স্বজনদের চোখে শহীদ কাউসার

শহীদ কাউসার সবসময় তাঁর পরিবারের জন্য আশার আলো হয়ে ছিলেন, তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ছিলেন।

শহীদের পিতা বলেন, ছেলের কথা কী বলব। কলিজার টুকরা আমার। ছোটকালে মারা গেলে এক কথা। আমার উপযুক্ত ছেলে, আমার আশা-ভরসার মূলকেই গুলি করে মেরে ফেলেছে, কী বলার থাকতে পারে? অনেক আশা ছিলো, এখন সব আশায় গুঁড়োবালি। মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে লাশ গ্রহণ করতে গিয়ে দেখলাম- পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছিল। নম্র-ভদ্র, নামাজি, পড়াশোনায় মনোযোগী ছেলে আমার- এখন সব শেষ হয়ে গেলে। মৃত্যুর কারণের জায়গায় ডেথ সার্টিফিকেটে হত্যাকারী ‘অজ্ঞাত’ লিখেছে। অথচ হত্যাকারী জ্ঞাত ও তারা পুলিশ বাহিনী। চেষ্টা চলছে সেটি সংশোধনের। আমি আমার সন্তান হত্যার বিচার চাই।

ছোট ভাই ইমরান হোসেন জানায়, “ভাইয়ার শেষ ফোন কলটি ছিল বাবার সাথে শেষ কথা। বাবাকে সে বলেছিল সে ভালো আছে। তার জন্য দোয়া করতে। ছোট ভাই মানে আমাকে (ইমরানকে) দেখে রাখতে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাড়ি ফিরে আসবে।”

জাফরুল্লাহ বলেন, “ভাই অনেক মিষ্টভাষী ছিলেন এবং মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতেন।” তার ছোট ভাই বলেন, “ভাইয়া কখনো অযথা আড্ডা দিতেন না, সবসময় পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি ছিলেন অনেক যত্নবান এবং দায়িত্বশীল।”

ইকরামের বোন জালাতুল ফেরদৌস জানান, আমাদের পরিবার খুবই গরিব। পড়ালেখা শেষ করে ইকরাম পরিবারে হাল ধরবে এবং আমাদের দুঃখ ঘোচাবে এমনটাই আশা করেছিলাম। এখন আমার ভাই নেই, আমাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই। আমরা আশা করবো সমাজের বিত্তবানরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসারের বন্ধু আজমীর বলেন, আমি এটাকে মৃত্যু বলবো না-এটা হত্যা। যে দেশে মানুষ ঠিকমতো তার অধিকারের কথাও বলতে পারে না সেটা কোন গণতান্ত্রিক দেশ হতে পারে না। আজ অধিকারের জন্য মাঠে নামায় আমার বন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। আমি শুধু এই হত্যা না কোটা সংস্কার কে কেন্দ্র করে যত শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক তদন্ত করে বিচার চাই।

সুবর্ণা মুস্তাফা নামে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনে ফেনি জেলার প্রথম শহিদ। আপনার মেধার জোরে সরকারি চাকরি পাওয়া আর হলো না ভাইয়া। আমাদের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ দিয়ে গেলেন নিজের জীবনের বিনিময়ে। মহান আল্লাহ আপনাকে বেহেস্তের উচ্চ মাকাম দান করুক।

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ কাউসারের বাবা একজন স্কুলশিক্ষক, অল্প বেতনে তিনি ৫ সদস্যের সংসার চালায়। শহীদ কাউসারের পড়াশোনা শেষ করে পরিবারের দায়িত্ব নেয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু পুলিশের গুলিতে সেই স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটে। সন্তান হারিয়ে তার মা এখন মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, তারা

অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহিদ কাউছারের বাবা একজন শিক্ষক। অল্প বেতন পান, তা দিয়ে ৫ জনের সংসার চালান। শহিদ কাউসার পড়াশোনা শেষ করে পরিবারের হাল ধরবেন এমন স্বপ্ন ছিলো। কিন্তু পুলিশের গুলি তার সে স্বপ্ন কেঁরে নেয়। সন্তানকে হারিয়ে তার মা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। সন্তানদের শিক্ষিত করতে জমি বিক্রি করে- পরিবার আর্থিকভাবে শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে।

প্রস্তাবনা

শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসারের পরিবার বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটে দিনযাপন করছে। তাদের এই দুর্দশা লাঘবে নিম্নোক্ত কিছু সহযোগিতা প্রয়োজন, যা পরিবারটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে:

১/ বাসস্থান প্রয়োজন: শহীদের পরিবার বর্তমানে বাসস্থান সংকটে রয়েছে। তাদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। একটি স্থায়ী বাসা পেলে পরিবারটি নিরাপদভাবে বসবাস করতে পারবে এবং দুঃশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে।

২/ বাবার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান: শহীদ ইকরাম হোসেনের বাবা বর্তমানে সীমিত ইনকাম অবস্থায় আছেন। তাঁর জন্য একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে তা তাঁর পরিবারের নিয়মিত আয়ের উৎস বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। পরিবারটি স্বনির্ভর হতে পারবেন।

৩/ ছোট ভাই-বোনদের শিক্ষার খরচ: শহীদের ছোট ভাই ইমরান হোসেন এবং বোন জান্নাতুল ফেরদাউস শিক্ষারত। তাদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। শিক্ষা খরচের দায়িত্ব নিলে শহীদ ইকরামের পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিক্ষিত হয়ে দেশ ও সমাজে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে। এই তিনটি সহযোগিতা শহীদ ইকরামের পরিবারকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহায়তা করবে এবং তাঁর আত্মত্যাগের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনে অবদান রাখবে।

এক নজরে শহীদ ইকরাম হোসেন কাউসার

নাম : ইকরাম হোসেন কাউসার

পেশা : ছাত্র

জন্ম তারিখ : ০১ জানুয়ারি ২০০০

জন্মস্থান : ফেনী

নিজ জেলা : ফেনী

পেশাগত পরিচয় : কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা

পিতার নাম : মাওলানা আনোয়ার হোসেন (বয়স: ৫৫, পেশা: শিক্ষক)

মায়ের নাম : রুমা আক্তার (বয়স: ৪০, পেশা: গৃহিণী)

মাসিক আয় : ১৫,০০০ টাকা

আয়ের উৎস : শিক্ষকতা

ভাইবোন : ছোট ভাই ইমরান হোসেন (বয়স: ২০, ছাত্র) এবং বোন জান্নাতুল ফেরদাউস (বয়স: ২৭)

পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৫ জন

আহত হওয়ার তারিখ ও সময় : ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, দুপুর ১:৩০ টা

মৃত্যুর তারিখ ও সময় : ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪:১৫ টা

মৃত্যুর স্থান : লক্ষ্মীবাজার, পুরান ঢাকা, কোতয়ালী, ঢাকা

আক্রমণকারী : পুলিশ

দাফনস্থল : পরশুরাম, ফেনী

শাহাদাত বরণের স্থান : লক্ষ্মীবাজার, পুরান ঢাকা

কবরস্থান : পরশুরাম, ফেনী